Vol. 49 | No. 1 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সমাজভাষাবিজ্ঞান : একটি তাত্ত্বিক ধারণা

Volume	49
Issue	1
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	গুলশান আরা
Published online	October 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v49i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i1.2
Pages	৪৯-৬০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সমাজভাষাবিজ্ঞান : একটি তাত্ত্বিক ধারণা

Check for updates

গুলশান আরা*

ভূমিকা

'সমাজভাষাবিজ্ঞান' (Sociolinguistics) ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম একটি শাখা। এটি একটি আন্তঃশাস্ত্রীয় জ্ঞানশাখা (Interdisciplinary branch of knowledge) বলে বিবেচিত। এর সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের (Social Science), বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞান (Sociology), নৃ-বিজ্ঞান (Anthropology), সমাজমনোবিজ্ঞান (Social Psychology), শিক্ষা (Education) ইত্যাদি জ্ঞানশাখার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সমাজভাষাবিজ্ঞান মূলত সমাজে ভাষার 'ব্যবহার' নিয়ে গবেষণা করে থাকে এবং ভাষার মধ্যে সমাজের গ্রন্থন আবিষ্কার করে। এক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক (ধ্বনিতাত্ত্বিক, শব্দতাত্ত্বিক, ব্যাকরণিক) ও সামাজিক (লিঙ্গ, বয়স, স্তরবিন্যাস, জাতিসত্তা) ভেদরূপ (Variables) বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

প্রেক্ষাপট

বিশ শতকের ষাটের দশকে সমাজভাষাবিজ্ঞান ভাষা অধ্যয়নের একটি বিশেষ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়। ভাষাতাত্ত্বিক, নৃ-তাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানী ও অন্যান্য জ্ঞানশাখায় বিচরণরত মনীষীগণ মানুষের ভাষা ও সামাজিক জীবনের সম্পর্ক বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ভাষা একটি স্বয়ংক্রিয় সংশ্রয় (Autonomous System) যা সামাজিক বা ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত নয়। ভাষাবিজ্ঞানসংক্রান্ত এ তত্ত্বকে অসার প্রমাণ করে দেয় বিভিন্ন সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণা। এসব গবেষণা থেকে দেখা যায়, ভাষা সম্পর্কে প্রমিত (Standard) ও অপ্রমিত (Nonstandard) বলে যে ধারণা রয়েছে তা কেবল সামাজিক মূল্যায়ন, ভাষাতাত্ত্বিক নয়। ভাষা মানুষের সামাজিক বৈশিষ্ট্যাবলি তুলে ধরে। সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে দেখা যায়, ভাষা হচ্ছে এমন এক প্রপঞ্চ যা সামাজিক বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে। বিশ শতকে সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলেও বেশ আগে থেকে এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাষাবিজ্ঞানের আরও অনেক শাখার মতো প্রাচীন ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানী পাণিনিকে সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী পল কিপারস্কি মনে করেন, 'অষ্টাধ্যায়ী'-তে পাণিনি রচিত সূত্রসমূহ দ্বারা সমাজভাষাবিজ্ঞানের চিন্তার সূত্রপাত ঘটেছে : "Sophisticated attempts at capturing the stylistic preferences among variants which are characteristic of any living language." (Kiparsky, 1979 : 1)। অর্থাৎ, ভাষা

---

*সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যবহারের বৈচিত্র্যের মধ্যে শৈলীগত অভিরুচির বিষয়টি আয়ত্ত করার নিপুণ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় যা যে কোনো জীবিত ভাষার বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত। তিনি দাবি করেন যে, লেবোভের ভাষাবৈচিত্র্যের সূত্রসমূহ (variable rules) পাণিনির ভাষিক সূত্র থেকে উৎসারিত। আধুনিক সমাজভাষাবিজ্ঞানের দুটি শাখা, উপভাষা (dialects) ও মিশ্রভাষা (mixed language) নিয়ে উনিশ শতকের আগে কাজ হয়েছে। যাঁরা এ দুটো বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলেন : Hugo Schuchardt (1882), Dirk Hesseling (1897), Addison Van Name (1869-1870)। আধুনিক কাঠামোবাদের জনক ফের্দিনঁ দ্য সোস্যুরও ভাষাকে 'Social fact' হিসেবে দেখেন । তাঁর মতে, "Language is not complete in any speaker, it exists perfectly only within a collectivity" (1959:14)। তবে সোস্যুর এক্ষেত্রে ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডারখেইম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ডারখেইম সমাজবিজ্ঞানকে 'The science of social fact' বলে মনে করেন । বিশ শতকের শুরুতে আমেরিকার ভাষাবিজ্ঞানীরা ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু আমেরিকান ইন্ডিয়ান ভাষাগুলোর প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর ভাষাতাত্ত্বিক বর্ণনাকালে তাঁরা ওইসব ভাষাসমাজের সাংস্কৃতিক কাঠামোর সাথে ভাষার সম্পর্ক নিয়ে নানাভাবে গবেষণা করেন। যার ফলে সমাজভাষাবিজ্ঞানের গবেষণায় জাতিতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির (Ethnographical approach) সূচনা ঘটে। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন : ফ্রান্‌জ বোয়াস, এডওয়ার্ড সাপির, লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড প্রমুখ। ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক গবেষণার ইতিহাসে ১৮৮০ সালে জে.বি. হোয়াইটের আপাচি অভিবাদন রীতিবিষয়ক প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে এডওয়ার্ড সাপির ভাষাবৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা করেন। ১৯২৩ সালে ম্যালিনোওস্কি রচনা করেন একটি প্রবন্ধ 'The problem of meaning in primitive languages'। মেরি হাস-এর প্রবন্ধ 'Men's and women's speech in Koasati' (১৯৪৪) এবং ম্যাকডেভিডের 'Post vocalic/-r/ in South Carolina — a social analysis'-এ দুটো প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য (হুমায়ুন, ২০০১ : ১৫)। তবে বিশ শতকের ষাটের দশকে ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণা ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ (Generative Grammar), মনোভাষাবিজ্ঞান (Psycholinguistics) ও সমাজভাষাবিজ্ঞান — এ তিনটি অন্যতম শাখার সুস্পষ্ট সংযোজন ঘটে। 'Sociolinguistics' পরিভাষাটি ১৯৫২ সালে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন কবি ও দার্শনিক হাভের সি কারি। তিনি তাঁর সময়ে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা ক্ষেত্রে সামাজিক পটভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। বিভিন্ন সমাজভাষাবিজ্ঞানীর গবেষণায় সমাজভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও ক্ষেত্র দৃঢ়তা লাভ করে এবং এর পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : উইলিয়াম ব্রাইট, জোশুয়া ফিশম্যান, অরভিন-ট্রিপ, পিটার ট্রাজিল, ইউরিয়েল ওয়াইনরাইখ, চার্লস ফার্গুসন, উইলিয়াম লেবোভ, ডেল হাইমস, জন জে. গাম্পার্য, জোসেফ এইচ. গ্রিনবার্গ, আইনার হগেন প্রমুখ ।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পরিধি

সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অত্যন্ত বিস্তৃত। উইলিয়াম ব্রাইট, জোশুয়া ফিশম্যান, অরভিন-ট্রিপ, পিটার ট্রাজিল প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত সমাজভাষাবিজ্ঞানী এ জ্ঞানশাখার বিষয়বস্তু ও পরিধি

নির্ধারণ করেছেন। উইলিয়াম ব্রাইটের মতে, "ভাষিক বৈচিত্র্যই (Liguistic diversity) সমাজভাষাবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়। ফিশম্যান 'The Sociology of Language' (১৯৭১) শীর্ষক প্রবন্ধে ভাষার সমাজবিজ্ঞানের (Sociology of Language) তিনটি বৃহৎ এলাকা নির্দেশ করেছেন। বর্ণনামূলক ভাষার সমাজবিজ্ঞানের (Descriptive Sociology of Language) মধ্যে তিনি বিভিন্ন ধরনের ভাষা সরণ (Language Shift), বুলিভাণ্ডার (Linguistic Repertoire), ভাষার রূপবদল (Metaphorical switching) প্রভৃতির উল্লেখ করেন। গতিশীল ভাষার সমাজবিজ্ঞানের (Dynamic Sociology of Language) অন্তর্ভুক্ত করেছেন স্থিতিশীল (Stable) ও অস্থিতিশীল (Unstable) দ্বিভাষিকতাকে (Bilingualism)। ভাষার প্রায়োগিক সমাজবিজ্ঞান (Applied Sociology of Language) মূলত প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞান (Applied Linguistics)-এর বিষয়াবলিকেই আলোচ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। যেমন, ভাষাশিক্ষাদান, অনুবাদ, লিখনরীতি, ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা প্রভৃতি। তবে, বিভিন্ন সমাজভাষাবিজ্ঞানী ফ্রেমবন্দি করে বা না করে সমাজভাষাবিজ্ঞনের যে বিষয়গুলো শনাক্ত করেছেন তা হলো, সংজ্ঞাপনের নানা দিক (যেমন, নৃবৃত্ততত্ত্ব, দক্ষতা, পরিস্থিতি), ভাষা সম্প্রদায়, আত্মীয়তাবাচক শব্দ, ভাষিক আপেক্ষিকতাবাদ, ভাষাবৈচিত্র্য (রেজিস্টার, রীতি, দ্বিবাচন, বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, নৃ-গোষ্ঠী, সামাজিক শ্রেণি, উপভাষা, জাতি), সংকুচিত ও বিস্তৃত কোড (Restricted and Elaborated code), ভাষা মনোভঙ্গি (Language attitude), ভেদরূপ, দ্বিভাষিকতা, বহুভাষিকতা, ভাষা সরণ-মিশ্রণ, ভাষা পরিবর্তন-সংযোগ, ভাষানীতি, ভাষা-পরিকল্পনা, ভাষা ও আনুগত্য (Language and loyality), ভাষা পরিগ্রহণ (Language adaptation), ভাষা ও পরিচয় (Language and identity), পিজিন, ক্রেয়ল, লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা ইত্যাদি।

সমাজভাষাবিজ্ঞান ও ভাষার সমাজবিজ্ঞান

সৃষ্টিশীল ব্যাকরণপ্রণেতা নোয়াম চমস্কি বিশ শতকের ষাটের দশকে তাঁর ভাষিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এতে তিনি ভাষাবোধ (Linguistic competence) ও ভাষা প্রয়োগ (Linguistic performance) — এ দুটো নতুন ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। একজন আদর্শ বক্তা-শ্রোতা (Ideal speaker-hearer)-র আদর্শ পরিস্থিতিতে ভাষাবোধের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে, সেই আদর্শ পরিস্থিতি কোনো ভাবেই বক্তা-শ্রোতার বাক্য সৃষ্টি ও অনুধাবনকে বাধাগ্রস্ত করবে না। (Chomsky : 1965)। চমস্কির এই ভাষিকতত্ত্ব সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব থেকে বিপরীত স্রোতে প্রবাহিত। এই তত্ত্ব সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যেও বিভাজন সৃষ্টি করে। একদল সমাজভাষাবিজ্ঞানী ভাষাকে মানবসমাজের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেই বিচার বিশ্লেষণ করেন। অন্যদিকে সৃষ্টিশীল তত্ত্বে বিশ্বাসীরা ভাষাকে একটি আদর্শায়িত (Idealized), অ-সামাজিক, মনোভাষা-বৈজ্ঞানিক দক্ষতা হিসাবে বিবেচনা করেন। চমস্কির ভাষিক কাঠামো দৃষ্টিনিবদ্ধ করে ভাষার দ্বারা কী উৎপাদিত হতে পারে এবং কীভাবে তা হয়ে থাকে। অন্যদিকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার চেষ্টা করা হয় একটি ভাষায় কোন সামাজিক পরিস্থিতিতে, কখন, কে, কাকে, কার উপস্থিতিতে, কোথায় কোন রীতিতে কী বলে (Saville-Troike, 1982:8)।

এ মতবাদে বিশ্বাসীরা কেবল মানবমস্তিষ্কে পূর্বসংরক্ষিত সূত্রাবলি সক্রিয়করণের জন্য পরিজ্ঞানমূলক (Cognitive) কোনো বিষয় বলে ভাষা অর্জনকে মনে করেন না বরং এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, যা সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেই ক্রিয়াশীল হয়। ডেল হাইমস (১৯৭১) চমস্কির ভাষাবোধের বিপরীতে সংজ্ঞাপক দক্ষতা (Communicative Competence)-এর উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, একটি শিশুর ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে সামাজিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দুটো প্রপঞ্চই কার্যকর থাকে। যদি তা না হয় তবে শিশুটি যেসব বাক্য উৎপাদন করবে তা স্রেফ 'একটি সামাজিক দৈত্য' (A social monster) বলে বিবেচিত হবে (১৯৭৪:৭৫)। মূলত ডেল হাইমসের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মানুষের ভাষা ব্যবহারের দিকটি সঠিকভাবে উন্মোচিত হয়। উইলিয়াম লেবোভও মনে করেন, সমাজবিচ্ছিন্ন ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে 'ভাষার সমাজবিজ্ঞান' ও 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' — এ দুটো ধারণা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয় দুটোর সীমারেখা খুব দৃঢ় কিছু নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই এরা সম্পূরক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। সমাজভাষাবিজ্ঞান গবেষণায় ভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং ভাষার উপর সামাজিক প্রপঞ্চের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করা হয়। অন্যদিকে ভাষার সমাজবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একটি সমাজের প্রকৃতি বোঝার জন্য সমাজে প্রচলিত ভাষার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ভাষা ও সমাজ এ দুটোর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সামষ্টিক সমাজভাষাবিজ্ঞান (Macro Sociolinguistics) ও ব্যষ্টিক সমাজভাষাবিজ্ঞান (Micro Sociolinguistics) — এ দুটো শাখার উন্মেষ ঘটে। সামষ্টিক সমাজভাষাবিজ্ঞানে ভাষাকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে অধ্যয়ন করা হয় এবং সমাজে ভাষার বৃহত্তর ভূমিকা সম্পর্কে গবেষণা করা হয়। ভাষার আভ্যন্তর কাঠামো বা বৈচিত্র্য এর আলোচ্য বিষয় নয়। ভাষা নির্বাচন (Language choice), ক্ষেত্র (Domain), ভাষা পরিকল্পনা (Language planning), শিক্ষানীতি (Education policy) ইত্যাদি এ শাখার বিবেচ্য বিষয়। স্থূলভাবে ভাষার সমাজবিজ্ঞান ও সামষ্টিক সমাজভাষাবিজ্ঞান সমার্থক বলে বিবেচনা করা হয়। ব্যষ্টিক সমাজভাষাবিজ্ঞানে সমাজের মধ্যে ভাষার বিস্তৃতি ও অভ্যন্তরীণ কাঠামোর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ভাষার বৈচিত্র্য ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় ভাষা ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়াও কথোপকথন বিশ্লেষণ (Conversation analysis), সংহিতা বদল (Code switching), ভাষা সংযোগ (Language contact) ইত্যাদি এর আলোচ্য বিষয়।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব

সমাজবিজ্ঞানে মানব সমাজের জন্য, অর্থাৎ সমাজ কীভাবে কাজ করে সে-সম্পর্কে তিনটি তত্ত্ব রয়েছে। এ তিনটি তত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজভাষাবিজ্ঞানের জন্যও তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। যথা :

১. ক্রিয়াবাদ (Functionalism) : এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ হচ্ছে কতকগুলো ক্রিয়াশীল অংশের সমষ্টি। তাই সমাজের কোনো বিষয়কে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সামগ্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সমাজের যে কোনো একটি অংশ নিয়ে কাজ করার

সময় তা সমাজ-সংশ্রয়ের (Social System) প্রেক্ষাপটে করা হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ-সংশ্রয় ও মূল্যবোধের ঐকমত্য (Value Consensus) সমন্বিত করার চেষ্টা করেন। সমাজভাষাবিজ্ঞানীরাও ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সময় এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন। এছাড়াও তাঁরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে থাকেন —

(ক) কৃষ্টি (Culture) : সমাজবিজ্ঞানীরা কৃষ্টি বলে বোঝান একটি সমাজের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের জীবনযাপন প্রণালী, ধারণা ও অভ্যাসের সমষ্টি যা তারা নিজেদের মধ্যে ধারণ করে ও সমাজের অন্য সদস্যদের সাথে ভাগ করে নেয়। কৃষ্টি প্রজন্মান্তরে স্থানান্তরিত হয়। একে জীবন যাপনের ছক হিসেবেও দেখা হয়ে থাকে।

(খ) সামাজিকীকরণ (Socialization) : সামাজিকীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে সংশ্লিষ্ট সমাজের কৃষ্টি উপযোগী করে নিতে পারে। প্রাথমিকভাবে শৈশবকাল থেকে পরিবারের মধ্যে সামাজিকীকরণ ঘটে থাকে । তবে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া পরিবারের বাইরেও হয়ে থাকে।

(গ) আদর্শ ও মূল্যবোধ (Norms and values) : একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য ও সঠিক আচরণের জন্য নির্দেশনা হচ্ছে 'আদর্শ'। এসব আদর্শই বৃহত্তর সমাজে আইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মূল্যবোধ বলতে বোঝায় সাধারণ কিছু গুণ বা কাঙ্ক্ষিত আচরণ যা সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। একটি সুশৃঙ্খল ও সুস্থির সমাজের সকল সদস্য সাধারণ আদর্শ ও একই মূল্যবোধের অংশীদার হয়ে থাকে।

(ঘ) মর্যাদা ও ভূমিকা (Status and role) : মর্যাদা হচ্ছে সামাজিক অবস্থান, যা সমাজ কর্তৃক সদস্যদের দেওয়া হয়ে থাকে। এটি জন্মগত (লিঙ্গ, বিত্ত-বৈভব) বা অর্জিত (শিক্ষক, লেখক, গায়ক, ডাক্তার প্রভৃতি) হতে পারে। তবে বর্ণভিত্তিক সমাজে জন্মের কারণে কারো পেশা নির্ধারিত হতে পারে, যা অন্য সমাজে অর্জিত হয়। কতকগুলো আদর্শ মিলে ভূমিকা গঠিত হয়। একই মানুষ দিনের বিভিন্ন সময়ে নানারকম ভূমিকা পালন করে থাকেন। কর্মক্ষেত্রে একজন শিক্ষক, পারিবারিক জীবনে মা ও স্ত্রী, ব্যাংকে গ্রাহক ও অবসর সময়ে কবি হতে পারেন।

২. মার্কসবাদ (Marxism) : কার্ল মার্কস প্রবর্তিত তত্ত্ব, যেখানে দ্বন্দ্বকে সমাজের সাধারণ ও বিদ্যমান বৈশিষ্ট্য (Persistent feature) হিসাবে দেখা হয়েছে। এই তত্ত্বে মানুষের অর্থনৈতিক সংশ্রয়ে ক্ষমতা ও সম্পদের সমবণ্টন হয় না বলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যে বৈপরীত্য বিরাজ করে, তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভাষা, আদর্শবাদ (Ideology) ও সামাজিক শ্রেণি এবং ভাষার অন্যান্য পার্থক্য অধ্যয়নের জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গি বেশি উপযোগী বলে অনেক বিশ্লেষক মনে করেন।

৩. মিথস্ক্রিয়াবাদ (Interactionalism) : এটি সমাজবিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, যা একই সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতার স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করে। এতে মনে করা হয়, ভাষার অর্থ পূর্বনির্ধারিত কোনো বিষয় নয়, তা পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সময় সৃষ্টি, পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হতে পারে। এখানে মনে করা হয়, মিথস্ক্রিয়ার সামাজিক সূত্রগুলো খুব একটা পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট নয়।

বৈচিত্র্যবাদী সমাজভাষাবিজ্ঞান (Variationist Sociolinguistics)

উইলিয়াম লেবোভের গবেষণার সূত্র ধরেই সমাজভাষাবিজ্ঞানের এই শাখার বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে। সামাজিক পটভূমিতে ভাষার বৈচিত্র্য ও ভাষার পরিবর্তন ঘটে থাকে। ভাষার এসব বৈচিত্র্যের মূল কারণ সামাজিক বা অভাষাতাত্ত্বিক। এগুলোকে লেবোভ বলেছেন সামাজভাষাবৈজ্ঞানিক ভেদরূপ (Sociolinguistic variables)। এ ভেদরূপগুলো হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে একই বিষয়কে নানাভাবে উপস্থাপনের জন্য সামাজিক তাৎপর্যবহ একসেট বিকল্প পন্থা। মানব সমাজের সকল সদস্যই একাধিক বাক সম্প্রদায়ের অংশ। এসব সম্প্রদায়ভুক্তির ক্ষেত্রে চারটি উপাদান (Factor) খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যথা : বয়স, লিঙ্গ, নৃ-জাতিসত্তা (Ethnicity) ও সামাজিক স্তর।

ভেদরূপ সূত্র (Variable rules)

চমস্কীয় ব্যাকরণ মডেলে একটি বাক্য গভীরতল থেকে উপরিতলে আসা পর্যন্ত এতে কিছু আবশ্যিক ও কিছু ঐচ্ছিক সূত্র প্রযুক্ত হয়। তেমনি লেবোভও কিছু ভেদরূপ সূত্রের কথা উল্লেখ করেন, যেগুলো প্রযুক্ত হয়ে একটি ভাষা সংশ্লিষ্ট সমাজোপযোগী হয়ে ওঠে। এগুলো মূলত ঐচ্ছিক সূত্র হিসেবেই ভাষিক বৈচিত্র্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভাষার ব্যাকরণ ও ভাষা ব্যবহারের মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক থাকলেও ভাষাবৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে তা কীভাবে কাজ করে? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পাশাপাশি অন্তঃ ও আন্তঃ ব্যক্তিক ভাষাবৈচিত্র্যের স্বরূপ ও সম্পর্ক অধ্যয়ন করে বৈচিত্র্যবাদী সমাজভাষাবিজ্ঞান। আর এ ধারায় সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক ভেদরূপগুলোকে বলা যায় প্রত্যেক কথকের নিজস্ব নির্বাচন। ভাষারবৈচিত্র্য ঘটতে পারে ধ্বনি, শব্দ, বাক্য কিংবা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে। বৈচিত্র্যবাদী সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে পরিমাণগত পদ্ধতি (quantitative method) প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে একজন/একদল বক্তার কথা বা কথা বলার রীতিতে ভাষিক কাঠামোর পৌনঃপুনিকতা নির্ধারণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। উইলিয়াম লেবোভের নিউইয়র্ক শহরে পরিমাণগত পদ্ধতিতে ভাষিক বৈচিত্র্যের গবেষণা বৈচিত্র্যবাদী গবেষণার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির মানুষের 'র' ধ্বনি উচ্চারণ করা বা না করার পৌনঃপুনিকতা নির্ধারণ করে তাদের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি নিউইয়র্ক শহরের তিনটি বিপণিতে পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ওই শহরের অধিবাসীদের ভাষায় /-r/ মর্যাদাসূচক চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উচ্চশ্রেণির লোকেরা /-r/ ব্যবহার করে সর্বাধিক, মধ্যশ্রেণির লোকেরা করছে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে, আর নিম্নশ্রেণির লোকেদের ভাষায় /-r/-এর ব্যবহার সবচেয়ে কম। ভাষিক বৈচিত্র্যসূত্রে রূপান্তর ব্যাকরণের মতো কিছু প্রতীক চিহ্নের ব্যবহার করা হয়, যেমন : → (অর্থ, পরিণত হয়), # (অর্থ, রূপমূল সীমা), / (অর্থ, প্রতিবেশ), <- #> (অর্থ, রূপমূল সীমার অনুপস্থিতিতে বিলুপ্তি প্রক্রিয়া সংঘটিত), ø (অর্থ, বিলুপ্ত) ইত্যাদি । এসব সূত্র দ্বারা ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থসহ সব রকম পরিবর্তন দেখানো ও সামাজিক উপাদানসমূহ উপস্থাপন করা সম্ভব। একটি সামাজিক দল (social group)-এর ভাষা ব্যবহার একগুচ্ছ ঐচ্ছিক সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সূত্রগুলো প্রতিবেশ-নির্ভর ও সামাজিক উপাদানসমূহও এর অর্ন্তভুক্ত হতে পারে। বাংলা

ভাষার একাধিক সর্বনামসূচক রূপমূল (আপনি, তুমি, তুই) থেকে আনুষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক পরিবেশ, বক্তা-শ্রোতার বয়স, শ্রেণি, শিক্ষা ইত্যাদি বিবেচনা করে সর্বনাম নির্বাচন করা হয়। ভাষা পরিবর্তনের ভাষিক ও সামাজিক বিষয় বিবেচনা করে আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম Varbrul তৈরি করা হয়েছে, যা একগুচ্ছ ভাষিক উপাত্ত থেকে পরিবর্তনের সম্ভাব্য সূত্র বের করতে পারে।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের বৈচিত্র্যবাদী সমাজভাষাবিজ্ঞান শাখাটি বিকাশ লাভ করেছে আমেরিকার বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী উইলিয়াম লেবোভের মাধ্যমে। তিনি সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যথার্থভাবে গবেষণা পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করেন। পরিমাণগত পদ্ধতি প্রয়োগ করে নিউইয়র্ক শহরের ভাষাবৈচিত্র্যের অনুসন্ধান ভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণায় একটি ধ্রুপদী কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সমাজভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে আত্মপ্রকাশের পূর্বে (১৯৪৯-১৯৬১ সন পর্যন্ত) তিনি ছিলেন একজন শিল্পরসায়নবিদ। ১৯৬৩ সনে এমএ থিসিসের জন্য তিনি মার্থাজ ভিনিয়ার্ডের উপভাষার পরিবর্তনসমূহকে বেছে নেন। তিনি তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ইউরিয়েল ওয়াইনরাইখ-এর তত্ত্বাবধানে। তিনি 'নিউ ইয়র্ক শহরের সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক স্তর বিন্যাস' শীর্ষক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেন। সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক বৈচিত্র্যবিষয়ক গবেষণায় তিনি উপাত্ত সংগ্রহের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করেন তা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সনে *Social stratification of English in New York City* শিরোনামে। এছাড়াও *African-American Vernacular English (AAVE)* তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম, যেখানে তিনি AAVE অর্থাৎ Black English-কে কম মর্যাদাসম্পন্ন (Substandard) নয় বরং নিজস্ব ব্যাকরণসূত্র-সংবলিত ইংরেজি ভাষার একটি প্রকার (Variety) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। শেষোক্ত দুটো গবেষণাকর্মে তিনি পরিমাণগত পদ্ধতির (Quantitative methodology) প্রবর্তন করেন। সম্প্রতি আমেরিকার ইংরেজি ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন বিষয়ে গবেষণা করে তিনি স্বরবর্ণের ধারাবাহিক পরিবর্তনের কাঠামোতে (Patterns of chain shift of vowels) দেখান একটি ধ্বনি পর্যায়ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ধ্বনিকে প্রতিস্থাপন করছে। *Atlas of North American English (2006)* শীর্ষক রচনায় তিনি ও তাঁর সহযোগী লেখকগণ এ ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। লেবোভের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম হলো :

১. *The Study of Non Standard English* (1969);
২. *Language in the Inner City : Studies in Black English Vernacular* (1972);
৩. *Sociolinguistic Patterns* (1972);
৪. *Principles of Linguistic Change* (2001).

ভাষাবৈচিত্র্য (Language variation)

ভাষাবৈচিত্র্য অনুসন্ধান করে একজন বক্তা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির কথোপকথন থেকেও ব্যক্তির পরিচয় (Identity) স্পষ্ট হতে পারে।

সমাজভাষাবিজ্ঞানে ভাষাবৈচিত্র্যকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা, (ক) আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, (খ) সামাজিক বা সামাজিক স্তরভেদে ভাষাবৈচিত্র্য এবং (গ) রেজিস্টার ও রীতি। আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বা উপভাষার ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোধগম্যতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একই ভাষার দুটো রূপভেদ সাধারণত বোধগম্য হয়ে থাকে। তবে ভাষা ও আঞ্চলিক উপভাষার মধ্যে পার্থক্য সবসময় খুব পরিষ্কার নয়। যেমন, ডেনমার্ক ও নরওয়ের ভাষা পরস্পর বোধগম্য হলেও এ দুটো পৃথক ভাষা, আবার ক্যান্টনিজ ও ম্যান্ডারিন পরস্পর অবোধ্য হলেও একই চীনা ভাষার উপভাষা। প্রকৃতপক্ষে ভাষা ও আঞ্চলিক উপভাষার সম্পর্ক যতটা না ভাষাতাত্ত্বিক তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে যুক্ত। সামাজিক উপভাষা সৃষ্টি হয় বক্তার বয়স, সামাজিক শ্রেণি, লিঙ্গ, ধর্ম, পেশা, শিক্ষা প্রভৃতি উপাদানের উপর নির্ভর করে। কোনো বক্তা কথা বলার সময় এসব উপাদান গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে। ব্যক্তির ভাষা ব্যবহার সামাজিক পরিস্থিতি ভেদে ভিন্ন হয়। পরিস্থিতির ভিন্নতায় একজন রসায়নবিদ 'সোডিয়াম ক্লোরাইড' ও 'লবণ' — এ দুটো শব্দই ব্যবহার করতে পারেন (নাথ, ১৯৯৯ : ৬০)। ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ভাষার ব্যবহারগত ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। আইনের ভাষা, বিজ্ঞানের ভাষা সবই রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্ত। একটি রেজিস্টার থেকে অন্যটি শব্দ ও অর্থস্তরে ভিন্নতা প্রদর্শন করে। রেজিস্টার ও আঞ্চলিক উপভাষা এক বিষয় নয়। রীতি (Style) বলতে বোঝায় লেখা বা কথা বলার বিশেষ পন্থা। ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন স্তরে রীতির কারণে ভিন্নতা দেখা যেতে পারে। শব্দ, ব্যাকরণিক কাঠামো ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে এসব ভিন্নতা দেখা যায়।

পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াশীল সমাজভাষাবিজ্ঞান (Interactional Sociolinguistics)

পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াশীল সমাজভাষাবিজ্ঞান, সমাজভাষাবিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা। এর সাথে ভাষাবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ভাষা ব্যবহারকারীগণ পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কীভাবে ভাষার অর্থবোধকতা তৈরি করে তা ডিসকোর্স বিশ্লেষণের (Discourse analysis) মাধ্যমে অধ্যয়ন করা হয়। এর প্রবক্তা মূলত J. J. Gumperz এবং মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ভাষা ও সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। প্রসঙ্গায়িত (Contextualised) ভাষা ব্যবহার, মুখোমুখি (Face-to-face) মিথস্ক্রিয়া ছাড়াও ইলেকট্রনিক এবং লিখিতসহ অন্যান্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমাজভাষাবিজ্ঞান কাজ করে। তাছাড়া মিথস্ক্রিয়ার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন, সংহিতা বদল, ভাষাবৈচিত্র্যসহ কথোপকথন ব্যবস্থাপনা (Conversation management) নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়। নির্দিষ্ট সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ভাষিক কাঠামো আলোচনা ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয় হচ্ছে ভাষা ও পরিচিতি (Language and identity) আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ, ভাষা ও ক্ষমতা (Language and power), ভাষা ও লিঙ্গ (Language and gender) ইত্যাদি। এসব গবেষণায় গুণগত দৃষ্টিভঙ্গি (Qualitative approach) গ্রহণ করা হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাষা ব্যবহারকারীদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে ভাষার অর্থ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করা যায়। এর মূল উদ্দেশ্য ভাষিক ও সামাজিক উপাদানের মধ্যে সংগঠনগত বৈচিত্র্য তুলে ধরা।

ভাষা পরিবর্তন, ভাষা সংযোগ ও ভাষা আনুগত্য (Language change, language contact and language loyality)

স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে সকল প্রাকৃতিক ভাষার সকল ভাষাতাত্ত্বিক স্তরে পরিবর্তন সাধিত হয়। সমাজকাঠামোর আওতায় ভাষা ব্যবহারের কাঠামোও সতত পরিবর্তনশীল। তবে ভাষার পরিবর্তন খুব ধীর গতিতে এবং ক্রমান্বয়ে সাধিত হয়। খুব অল্প ক্ষেত্রেই ভাষা সংযোগের ফলে এ পরিবর্তন হঠাৎ করে হয়ে থাকে। ওয়াইনরাইখ ও অন্যান্যরা (Swann et al. 2004 : 166) মনে করেন, ৫টি ক্রমান্বিত ধাপে ভাষা পরিবর্তন সংগঠিত হয়ে থাকে। যথা : (১) পরিবর্তনের সূচনা, (২) সম্ভাব্য পরিবর্তন নির্ধারণ, (৩) সামাজিক প্রসঙ্গের ভূমিকা, (৪) পরিবর্তন সহায়ক মনোভঙ্গি ও (৫) এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় স্থানান্তর। এ বিষয়টি সমাজভাষাবিজ্ঞানের ভাষা পরিবর্তনে আলোচিত হলেও তা আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয় ভাষা পরিচর্যা (Language maintenance) অংশে। ভাষা সংযোগ বলতে বোঝায় একটি ভূ-খণ্ড বা বাক সম্প্রদায়ের দুটি ভাষার সহাবস্থান। ভাষা সংযোগ একদিকে যেমন ভাষা পরিচর্যা ও ভাষা সরণ তথা সামষ্টিক সমাজভাষাবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত, অন্যদিকে তেমনি ব্যষ্টিক সমাজভাষাবিজ্ঞানের কৃতঋণ (Borrowing), সংহিতা বদল ইত্যাদির সাথে জড়িত। ভাষার প্রতি আনুগত্য বলতে ভাষা সম্প্রদায়ের এমন একটি প্রচেষ্টাকে বোঝায় যখন সদস্যদের মাতৃভাষা হুমকির মুখে থাকা সত্ত্বেও ভাষার ব্যবহার অব্যাহত রাখে। একটি ভাষা এক বা একাধিক ভাষা দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এছাড়াও আরো অনেক কারণ থাকতে পারে, যা হতে পারে সামাজিক-অর্থনৈতিক-মনোবৈজ্ঞানিক। যেমন, কথক না থাকা, অভিবাসন, অন্য ভাষাসম্প্রদায় থেকে অনেক লোকের আগমন, ইচ্ছাকৃত ভাষা সরণ ইত্যাদি। ভাষা আনুগত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে জাতিসত্তার সাথে। তাই বলা যায়, ভাষা আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে জাতি বা কৃষ্টির প্রতি আনুগত্যকেই প্রতিফলিত করে। একটি ভাষা সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের ভাষা বা জাতিসত্তার প্রতি কতটা সচেতন তার উপর মূলত নির্ভর করে ভাষার প্রতি আনুগত্য। (Fishman, 1997 : 367)

নৃভাষাতাত্ত্বিক প্রাবল্য (Ethnolinguistic Vitality)

ভাষার প্রতি ভাষা সম্প্রদায়ের মনোভঙ্গি (Attitude), দ্বিভাষিকতা (Bilingualism), ভাষা সরণ (Language shift), ভাষা ক্ষয় (Language loss), ভাষা মৃত্যু (Language death) — এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে ওই সম্প্রদায়ের ভাষার শক্তিমত্তা বা দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করা যায়। এ প্রপঞ্চগুলো সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভাষার প্রকৃতি ও গুণ অনেকাংশে এসব প্রপঞ্চ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কোনো ভাষা-সম্প্রদায়ের বিশেষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ কোনো চাহিদার কারণে ভাষিক আচরণে সমাজতাত্ত্বিক ও মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া কাজ করে, যার ফলে ভাষা সম্প্রদায়ের ভাষা শক্তিশালী হয়ে ওঠে কিংবা দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বহুভাষিক প্রেক্ষাপটে এই প্রক্রিয়া ঘটতে পারে। এটি একটি ধারণাগত হাতিয়ার (Conceptual tool) মাত্র। এর মাধ্যমে ভাষাকে শক্তিহীন বা শক্তিমান করছে যেসব সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভেদরূপ (Socio-cultural variables) তা নির্ধারণ করা যায়।

দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতা (Bilingualism and multilingualism)

দুটো ভাষার মধ্যে সংযোগের ফলে দ্বিভাষিকতা সৃষ্টি হয়। নানা কারণে ভিন্ন দুটো ভাষার ব্যক্তিবর্গ পরস্পরের সান্নিধ্যে আসতে পারে। এ কারণগুলো হতে পারে, শিক্ষা, আধুনিক প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি। এসব পরিস্থিতিতে কেউ কেউ স্বেচ্ছায় দ্বিতীয় ভাষাটি শেখে, আবার অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে দ্বিভাষীতে পরিণত হয়। ভাষার সংযোগ সবচেয়ে বেশি হতে পারে একই দেশে, একই সম্প্রদায়ে, প্রতিবেশী কিংবা পরিবারের মধ্যে। তবে একটি দ্বিভাষিক রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই দ্বিভাষী হবে এমন কোনো কথা নেই। আবার ঐকভাষিক রাষ্ট্রের অনেক ব্যক্তিও দ্বিভাষিক হতে পারে। দ্বিভাষিকতার জন্য ভাষা সংযোগ প্রাথমিক শর্ত হলেও ব্যক্তি-পর্যায়ে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বেলজিয়াম, কানাডা, ফিনল্যান্ড, ভারত, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ দ্বিভাষিক হলেও এর অধিবাসী সবাই একই মাত্রায় দ্বিভাষী নয়। সাধারণভাবে মনে করা হয়, ঐকভাষী রাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা ব্যক্তিদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক দ্বিভাষিক হয়ে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর প্রতি তিনজন ব্যক্তির মধ্যে একজন ব্যক্তি কর্মোপলক্ষে, পারিবারিক কারণে কিংবা অন্য যেকোনো বিনোদনের জন্য দুই বা ততোধিক ভাষা ব্যবহার করতে পারে। সাধারণভাবে 'দ্বিভাষী' শব্দ দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যে দুটো ভাষায় পারদর্শী। বহুভাষিক রাষ্ট্র বা ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও কোনো কোনো দেশের অধিবাসী বহুভাষী হতে পারে। সমাজে সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর অনেকেই পড়াশোনা, কাজ-কারবার কিংবা নিছক বিনোদনের জন্য দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ ভাষাও শেখে। দ্বিভাষিকতার পূর্বশর্ত ভাষা সংযোগ এবং এর ফলাফল হতে পারে ভাষা সরণ (Language shift)। হগেন ১৯৫৩ সালে আমেরিকার অধিবাসী অনেক নরওয়েজীয় ভাষীর মধ্যে নরওয়েজীয় ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষায় সরণ প্রক্রিয়া একটি সাধারণ কাঠামোর মাধ্যমে দেখান : নরওয়েজীয় ঐকভাষিকতা → নরওয়েজীয়/ ইংরেজি দ্বিভাষিকতা → ইংরেজি/ নরওয়েজীয় মিশ্রণ → ইংরেজি ঐকভাষিকতা (Bright 1992:24)।

দ্বিভাষিকতার তাত্ত্বিক ভিত্তি

একজন দ্বিভাষী ব্যক্তির মনে দুটো ভাষার ব্যাকরণ বা জ্ঞান কীভাবে থাকে এবং দুটো ভাষার জ্ঞান একই পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়, কীভাবে একের অধিক ভাষার ব্যাকরণিক সংশ্রয় অর্জিত হয় এবং তা পর্যায়ক্রমিক বা একই সাথে হয় কিনা, ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে কী পার্থক্য দেখা যায় কিংবা কীভাবে দুই বা ততোধিক ভাষিক জ্ঞান কথক প্রয়োজনমাফিক ব্যবহার করে — এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে Volterra এবং Taeschner (১৯৭৮) তিনটি পর্যায়ক্রমিক ধাপবিশিষ্ট একটি মডেলের কথা উল্লেখ করেছেন, যার বর্তমান রূপ 'Unitary Language System Hypothesis', যেখানে বলা হচ্ছে দ্বিভাষী শিশুর বুলিভাণ্ডারে একটি ভাষা সংশ্রয়ই সংরক্ষিত থাকে। তবে তা দুটো ভাষা প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত হয়। দ্বিভাষী ব্যক্তিদের মধ্যে সংহিতা বদলের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। যখন কোনো ব্যক্তি এক ভাষায় শব্দ খুঁজে পায় না তখন সে অন্য ভাষার শব্দ

ব্যবহার করে। এমনকি একটি বাক্য শুরু করে এক ভাষায় কিন্তু শেষ হয় অন্য ভাষায়। তবে ফ্যাশন করার জন্য অনেকে ভিন্ন ভাষার শব্দ, বাক্য ব্যবহার করে। সাধারণত এ রকম ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর দুটো ভাষার কোনোটিতেই পূর্ণ দক্ষতা অর্জিত হয় না।

বাংলা ভাষা ও সমাজভাষাবিজ্ঞান

বাংলা ভাষায় সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত প্রয়োগ খুব একটা চোখে পড়ে না এবং এ বিষয়ে কাজ খুব বিস্তৃত নয় । এ বিষয়ে প্রথম রচনা সুকুমার সেনের 'বাঙলায় নারীর ভাষা' (১৯২৭)। আফিয়া দিল ১৯৭১ সনে প্রকাশ করেন *Bengali Baby Talk* শীর্ষক প্রবন্ধ, হিন্দু ও মুসলমানের মৌল শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে ১৯৭২ সালে তাঁর পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ *Hindu-Muslim Dialects in Bengali* রচনা করেন (অপ্রকাশিত)। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক অপরাধ জগতের ভাষার সূত্র উদঘাটন করে ১৯৭৩ সালে রচনা করেন *অপরাধ জগতের ভাষা* গ্রন্থটি (আজাদ, ২০০২ : ৯৯)। আত্মীয়তাবাচক শব্দ নিয়ে ডি এন বসুর প্রবন্ধ 'A Sociolinguistic study of the Bengali Kinship Terms' প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। মঞ্জুলী ঘোষ ও প্রভাকর সিনহা ১৯৭৫ সালে প্রকাশ করেন দ্বিভাষিকতা-বিষয়ক প্রবন্ধ 'Bilingualism and the Bengali of Bhagalpur'। ১৯৮৫ সালে রাজীব হুমায়ুনের সন্দীপের উপভাষা-বিষয়ক গ্রন্থ *Sociolinguistic and descriptive study of Sandvipi : a Bangla dialect* প্রকাশিত হয়। মনসুর মুসা মূলত ভাষা পরিকল্পনা বিষয়ে কাজ করেন। তাঁর *ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ* এবং *ভাষা পরিকল্পনার সমাজতত্ত্ব* শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে। উদয়নারায়ণ সিংহ ও মনিরুজ্জামান রচিত *Diglossia in Bangladesh* প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে। মৃণাল নাথের *সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা* ও *ভাষা ও সমাজ* প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৮৯ ও ১৯৯৯ সালে। পবিত্র সরকারের *ভাষা দেশ কাল* (১৯৮৫), *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি* (১৯৯১) এবং *ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ* (২০০৩) উল্লেখযোগ্য রচনা। হুমায়ুন আজাদ রচনা করেন *বাঙলা ভাষার শত্রু মিত্র* (১৯৮৩)। এছাড়া বাংলা ভাষার অবয়ব ও অবস্থান পরিকল্পনা বিষয়ে (লিপি ও বানান সংস্কার, পরিভাষা, ভাষা সমস্যা, সাধু-চলিত বিতর্ক, ভাষা সংক্রান্ত নানা বিতর্ক এবং ভাষা-আন্দোলন) অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। উল্লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ছাড়া আরও অনেক বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯৪) : *বাক্যতত্ত্ব*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।
আজাদ, হুমায়ুন, সম্পাদিত (২০০২) : *বাঙলা ভাষা*, ১ম খণ্ড, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
নাথ, মৃণাল (১৯৮৯) : *সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা*, বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি, ঢাকা ।
নাথ, মৃণাল (১৯৯৯) : *ভাষা ও সমাজ*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।
মনিরুজ্জামান (১৯৮৫) : *ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুসা, মনসুর (১৯৮৫) : *ভাষা পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
মুসা, মনসুর (১৯৯১) : *ভাষাচিন্তা প্রসঙ্গ ও পরিধি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।
মুসা, মনসুর সম্পাদিত (১৯৯৪) : *বাঙালীর বাংলা ভাষা চিন্তা*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা ।
সরকার, পবিত্র (১৯৮৫) : *ভাষা-দেশ-কাল*, জি.এ.ই পাবলিশার্স, কলকাতা।
সরকার, পবিত্র (২০০৩) : *ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।
হুমায়ুন, রাজীব (২০০১) : *সমাজভাষাবিজ্ঞান*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Asher, R.E. et al, ed. (1994) : *The Encyclopedia of Language and Linguistics*, Vol.-7, Pergamon Press Ltd., Oxford.

Bell, R.T. (1976) : *Sociolinguistics : Goals, Approaches and Problems*, Batsford, London.

Bright, William (1992) : *International Encyclopedia of Linguistics*, Oxford University Press, New York.

Chomsky, Noam (1965) : *Aspects of the Theory of Syntax*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Crystal, David (1971) : *Linguistics*, Pelican Publishing Company, Los Angeles.

Dil, Afia (1991) : *Two Traditions of the Bengali Language*, The Islamic Academy, Cambridge.

Fishman, Joshua A (1972) : *Language in Sociocultural Change*, Selected and Introduced by A. S. Dil, Stanford University Press, California.

Fishman J (1997). 'Language and ethnicity : the view from within.' In Coulmas F (ed.) The Handbook of Sociolinguistics, Oxford University Press.

Gumperz, John J (1971) : *Language in Social groups*, Selected and Introduced by A. S. Dil, Stanford University Press, California.

Greenberg, Joseph H. (1971) : *Language, Culture and Communication*, Selected and Introduced by A. S. Dil, Stanford University Press, California.

Hudson, R. (1980) : *Sociolinguistics*, Cambridge University Press, Cambridge.

Hymes, Dell (1964) : *Language, Culture and Society*, Allied Publishers Pvt. Ltd., Bangalore.

Hymes, Dell (1974) : *Foundation of Sociolinguistics : An Ethnographic Approach*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Joos, Martin (ed.) (1957) : *Readings in Linguistics*, American Council of Learned Societies, Washington.

Kiparsky, P. (1979) : *Pānini as a Variationist*, The MIT Press, Pune.

Saussure, F de (1959) : *Course in general linguistics*. Bally C, Sechehaye A & Riedlinger A (eds.), Baskin W (trans.), McGraw Hill, New York.

Saville-Troike, M. (1982) : *Ethnography of Communication*, Basil Black well, Oxford.

Swann, J. et al (2004) : *A Dictionary of Sociolinguistics*, Edinburgh University Press, Edinburgh.

Volterra V & Taeschner T (1978) : 'The acquisition and development of language by bilingual children', In *Journal of Child Language, 5, 311-326*, Cambridge University Press.